পলাশী ট্রাজেডির একটি ঐতিহাসিক মুল্যায়ন

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

মোহর আলী

[বাংলার মুসলিম শাসনের ইতিহাস আজো নিরপেক্ষতার আলোকে আলোচিত বা বিশ্লেষিত হয়নি। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, এ যাবৎকাল যা রচিত হয়েছে তা একদেশদর্শী। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিশেষ গোষ্ঠীর হীনস্বার্থ বিবেচনাপ্রসূত কতিপয় ইংরেজ ঐতিহাসিকের সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থের ইতিহাসগত সংরক্ষণ এবং তাদের অনুসারী কয়েকজন দেশীয় পণ্ডিতদের অবিরাম অনিরপেক্ষতার কারণে বাংলার মুসলিম শাসনের ইতিহাস সত্যের সাধারণ মানদন্ড থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়েছে। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার ক্ষেত্রে এই বেদনাদায়ক উদ্যোগ ছিলো সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপক। সিরাজের পতনের মধ্যদিয়ে যেহেতু উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয় এবং তথাকথিত আর্যশক্তির নবউত্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়-সেহেতু ইংরেজ এবং ইংরেজ অনুগত ঐতিহাসিকগণ প্রাণপণে বাংলা বিজয়ের কাহিনী নির্মাণ করতে গিয়ে সিরাজের চরিত্র, যোগ্যতা ও দেশপ্রেমকে অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন।

ডঃ মোহর আলী বাংলার ইতিহাসের এই একদেশদর্শী অনুসন্ধানের বিপরীতে প্রথমবারের মতো নিরপেক্ষ ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিহাসের তত্ত্বীয় বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণে তিনি সম্পূর্ণ আবেগহীন ও পক্ষপাতহীনভাবে বাংলার মুসলিম শাসনের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেছেন। হিস্ট্রি অব দি মুসলিমস অব বেঙ্গল নামক বিশাল ইতিহাসকারের বিশ্লেষণকেও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। আমরা এখানে তাঁর গ্রন্থের প্রথম খন্ডের শেষাংশ থেকে পলাশীর যুদ্ধ-পূর্ববর্তী সংকট, সিরাজের পতন-পরবর্তী বাংলার ইতিহাসের ধারা ও উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বগ্রাসী উত্থান সম্পর্কিত মূল্যায়ন তুলে ধরলাম। গ্রন্থাকার বর্তমানে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে ইমাম মোহাম্মদ ইবনে সউদ ইসলামীক বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক।]

১৭৫৭ সালের জুন মাসে পলাশীর করুণতম ট্রাজেডীর ফলাফল হিসেবে সিরাজদ্দৌলার পরাজয় ও হত্যার মধ্য দিয়ে নবাব মীর জাফরের নেতৃত্বে একটি পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্লাইভের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের শক্তিশালী ভিত্তি। মোগল সাম্রাজ্যের অমিত শক্তির ক্রমাবনতি এবং সাম্রাজ্যব্যাপী আন্তঃসংহতির অভাব, ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক বিরোধের অনিবার্য ফলাফলস্বরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন ভৌগোলিক অবস্থানের অনুসন্ধান, ১৭২৭ সালে মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর পর বাংলায় বিত্তবান ও প্রভাবশালী একটি হিন্দু বণিক শ্রেণীর উদ্ভব এবং দক্ষিণ এশিয়ায় বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার দুর্বার আকাংখা এগুলোর সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ার ফলাফল হিসেবেই সিরাজের পতন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। সিরাজউদ্দৌলা বস্তুত এই পরিস্থিতিগুলোর শিকার হয়েছিলেন।

পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকেই সিরাজ চরিত্র হননের একটি অসুস্থ প্রবণতা তৈরী হতে থাকে এবং যুদ্ধে পরাজয়ের সকল দায়-দায়িত্ব তার উপরেই নিক্ষেপ করা হয়। এটা সহজেই বোধগম্য যে, সিরাজের বিরোধিরাই পলাশী যুদ্ধ-পরবর্তী প্রায় দুই শতাব্দীকাল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সিরাজ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ও মূল্যায়নকে প্রভাবিত করেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে, এই মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সিরাজউদ্দৌলার সমর্থকদের কাছ থেকে অদ্যাবধি আমরা কোন প্রামাণ্য দলিল পাইনি। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সকল দলিলপত্র ও মূল্যায়ন সিরাজকে বিরোধিতা করেই রচিত হয়েছে সকল রচনা ও উৎসের ওপর আমাদের

অপ্রতিরোধ্য নির্ভরতা দুর্ভাগ্যবান নবাব সম্পর্কে আমাদেরকে একটি বিপরীতমুখী ভাবনায় অব্যস্ত করে তুলেছে।

সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ উত্থাপনের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে একটি অন্যতম হচ্ছে ১৭৫৭ সালের পয়লা মে অনুষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম সিলেক্ট কমিটির বৈঠকের ধারা বিবরণী। এই বৈঠকে সিরাজকে উৎখাতের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের হীন পরিকল্পার পক্ষে যে সকল যুক্তি দাঁড় করায় তা হচ্ছে- (ক) সিরাজ অসৎ এবং ইংরেজদের নির্যাতনকারী, (খ) তিনি ফরাসীদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, যার অর্থ হচ্ছে ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ এবং (গ) সিরাজ বাঙ্গালীদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছেন- যার ফলে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সহজেই ঘটতে পারে।

পরিষ্কারভাবে সিরাজকে উৎখাতের জন্য প্রস্তুত এইসব যুক্তি ইংরেজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, তাদেরই স্বকল্পিত বিষয়। সিরাজউদ্দৌলা কখনো ইংরেজ বণিকদের ওপর নির্যাতন করেননি, এমনকি কাশিমবাজার অবরোধ করবার পরও ইংরেজ সম্পত্তি লুণ্ঠন কিংবা বিনষ্ট করেননি। ক্লাইভ এবং ওয়াটস-এর দেয়া সাক্ষ্য থেকেও প্রমাণিত হয়েছে যে, সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের সমস্ত ক্ষতি পুষিয়ে দিয়েছিলেন এবং ১৭৫৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারীতে সম্পাদিত চুক্তির সকল শর্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে মেনে চলেছেন। এ ছাড়াও সিরাজ ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করেছেন এবং সব সময় উল্লেখ করেছেন যে, বাংলা থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দেবার কোন ইচ্ছেই তাঁর নেই। ইংরেজরা তাঁদের বাণিজ্য সুবিধের অপব্যবহার না করলে এবং নবাবের সার্বভৌমত্ব অগ্রাহ্য না করলে সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের সঙ্গে তাদের পুরনো সুবিধেগুলো বহাল রেখে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ইংরেজ বণিকরা তাদের প্রাপ্য বাণিজ্য সুবিধেগুলোকে বহুদূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে অত্যন্ত পরিষ্কার ও পদ্ধতিগতভাবে বাংলায় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে থাকে সকল প্রকার দুর্গ নির্মাণ না করা সংক্রান্ত নবাবের সুস্পষ্ট নির্দেশ অগ্রাহ্য করেই তারা গোপনে দুর্গ নির্মাণে অগ্রসর হয়। এমনকি, নবাবের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে তারা পলায়নকারী অভিযুক্তদের আশ্রয়ও দেয়। তথাকথিত ফরাসীদের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দুর্গ নির্মাণের কোন কারণই ইংরেজদের ছিলো না; এর উদ্দেশ্য ছিলো বাংলায় তাদেরই কথিত ও কল্পিত একটি বিপ্লব সাধন করা।

অনুরূপভাবে, ফরাসীদের সঙ্গে সিরাজের গোপন আঁতাতের ইংরেজ অভিযোগটিও ছিলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও কার্যকল্পিত। একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাজ্যের শাসক হিসেবে সিরাজ তাঁর রাজনৈতিক ধারণার ভিত্তিতেই রাজ্যর মধ্যে নিরপেক্ষতার নীতি যথাসম্ভব দ্রুত প্রয়োগ করেন। কিন্তু ক্লাইভ নবাবের আদেশ অগ্রাহ্য করে চন্দনানগরে ফরাসীদের ওপর হিংসাত্মক আক্রমণ চালিয়ে তাদের কুঠিগুলো দখল করে নেন। এই পরিস্থিতিতে নবাব তাঁর আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে ক্লাইভের আক্রমণ প্রতিহত করতে উদ্যত হন। তিনি ফরাসীদের গ্রেফতার করতে ইংরেজদের বাধা দেন। দক্ষিণ ভারতে একজন ফরাসী জেনারেলের কাছে নবাবের একটি চিঠি ইংরেজদের হস্তগত হলে ক্লাইভ এর মধ্যে নবাবের শত্রুতার সূত্র আবিষ্কার করেন। দুর্ভাগ্যবশত চিঠিটি ইংরেজদের হাতে পড়ে যায় এবং ইংরেজরা এই চিঠির মধ্যেই নবাব-ফরাসী গোপন আঁতাতের সন্ধান পায়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে- পত্র প্রেরণ সংক্রান্ত সম্পূর্ণ বিষয়টিই ছিলো ইংরেজ পরিকল্পিত একটি হাস্যকর ষড়যন্ত্র। পত্রের বিষয়টি সত্য ঘটনা হলেও নবাবের ক্লাইভ আক্রমণ-পরবর্তী ভূমিকা দেশীয় সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে সঠিক ছিলো। বাংলায় ফরাসীরা অত্যন্ত দুর্বল ছিলো এবং অদ্যাবধি এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে, ফরাসীরা যে-কোন অবস্থাতেই ইংরেজদেরকে আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে। সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে বিরোধের সূত্র উদ্ভাবন করতে গিয়ে এবং তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্যেই ইংরেজরা ফরাসী-নবাবের মধ্যেকার এইসব কাহিনীর উদ্ভব।

একইভাবে, ইংরেজরা বাংলার জনগণের মধ্যে সিরাজের জনপ্রিয়হীনতার উদাহরণ হাজির করতে গিয়ে জগৎশেঠ-উমিচাঁদ গ্রুপের দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগিয়েছে। মুর্শীদকুলী খানের সময় থেকেই এই গ্রুপ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো অধিকার করে আসছিলো। সিরাজ কলকাতা প্রশাসনের জন্য মানিকচাঁদের উপর নির্ভর করতেন। নবাবের রাজস্ব ও প্রশাসনিক নির্ভরতা রাজা রাম নারায়ণ, নন্দকুমার, রায় দুর্লভ রাম এবং মীর মদনের ওপরও বহুলাংশে বর্তমান ছিলো। নিশ্চিতভাবেই নবাবের এই গ্রুপের সহযোগিতা ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ সম্ভব ছিলো না। এমন কোন প্রমাণ নেই যে, নবাব এই গ্রুপের বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিতে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু এঁরা বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক কারণে পূর্ব থেকেই ইংরেজদের সঙ্গে জোটভুক্ত হবার চেষ্টা করেছিলেন। বস্তুত, এই জোটই সিরাজ পতনের অন্যতম কারণ।

সিংহাসন লাভের অব্যবহিত পর থেকেই নবাব সাহসিকতার সঙ্গে ঘষেটি বেগম ও শওকত জং-এর ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা প্রকাশ করেননি। কিন্তু তিনি কলকাতায় ইংরেজদের বিভিন্ন ভূমিকার প্রশ্নে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেননি। মানিক চাঁদের জটিল আচরণ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট পরিষদ নবাবকে ইংরেজবিরোধী ভূমিকার প্রশ্নে বাধা দান অব্যাহত রাখে। ইংরেজদের চন্দনানগর আক্রমণের প্রাক্কালে নবাব তাদের প্রতিরোধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু বিপুল পরিমাণ ঘুষের বিনিময়ে

প্রতিরোধ বাহিনীর নেতা নন্দকুমার বিশ্বাসঘাতকতা করেন এবং ইংরেজদের সঙ্গে হাত মেলান। একইভাবে জগৎশেঠ, উমিচাঁদ এবং রায় দুর্লভ রাম ইংরেজদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি গ্রহণে সিরাজকে বাধা দিতে থাকেন। ক্ষমতা লাভের ছয় মাসের মধ্যেই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল পরিপক্ক হয়ে ওঠে। এই লোকগুলোর সহযোগিতায় ক্লাইভ খুব সহজেই নবাব প্রশাসনকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিকল করে ফেলেন এবং নবাবের গোপন কাগজ ও চিঠিপত্র হস্তগত করেন। নবাব এসব ষড়যন্ত্রের সবকিছু জানতে পারেন। কিন্তু ব্যাপক বিস্তৃত এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তখন তাঁর কিছুই করার ছিলো না। কারণ, তিনি কাউকেই বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করতে পারেননি। পরিস্থিতি সম্পর্কে নবাবের সম্যক উপলব্ধি, সতর্কতা এবং তাঁর বাস্তব ধারণার প্রেক্ষিতেই তিনি মীর জাফরসহ বিশিষ্ট পরিষদবর্গের প্রতি দেশকে বিদেশীদের হাত থেকে রক্ষার জন্য বার বার আকুল আবেদন জানাতে থাকেন। তাঁরা প্রয়োজনের সময় বিশ্বাসঘাতকতারই প্রতিজ্ঞা করেন।

জগৎশেঠ এবং তাঁর গ্রুপের অন্যান্য সদস্যদের চেয়ে মীর জাফরের ভূমিকা কোন অংশেই কম লজ্জাকর ছিলো না। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করার মতো যে, ষড়যন্ত্রের অংশীদার হিসেবে নবাব মীর জাফরকে চাকরিচ্যুত ও গ্রেফতার করলেও পরবর্তীকালে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ঘটতো না। অত্যুৎসাহী ও ক্ষমতালোভী ইংরেজরা স্থানীয় বণিক শ্রেণীর সহযোগিতায় সিরাজের পতন ও একটি পুতুল সরকার গঠন না করা পর্যন্ত তাদের কার্যক্রম বন্ধ করতো না। পলাশীর মর্মান্তিক পরিণতির পর ইংরেজ মনোনীত মীর জাফরকে নবাব পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। কিন্তু অচিরেই এই নতুন, অক্ষম ও নতজানু নবাব ইংরেজ এবং দেশীয় ষড়যন্ত্রকারীদের স্বার্থ পূরণে ব্যর্থ হলে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। তাদের পরবর্তী নির্বাচিত নবাব মীর কাশিম তো একইভাবে স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যর্থ হলেও দেশের প্রশাসন ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু অচিরেই তিনি স্বাধীন ভূমিকা গ্রহণের জন্য ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন এবং অবশেষে ক্ষমতাচ্যুত হন।

আলীবর্দী খান কর্তৃক সিংহাসন লাভ এবং আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে বিরোধিতা ও শত্রুতা লাভের ক্ষেত্রে সিরাজের নিজস্ব অবস্থান ও ভূমিকার কোন দোষই ছিলো না। মাত্র চৌদ্দ মাসের শাসনামলে তিনি শত্রুতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজস্ব অবস্থান সংহত করতে চেয়েছিলেন। তিনি খুব স্বাভাবিকভাবেই সাফল্য লাভ করতেন, কিন্তু তাঁর কয়েকজন আত্মীয়দের বিশ্বাসঘাতকতায় তা সম্ভব হয়নি। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সিরাজ তাঁর নিজের দিক থেকে এবং দেশের দিক থেকে ইংরেজ এবং ফরাসী উভয়ের কাছেই সমান থাকার চেষ্টা করেছিলেন। ব্যক্তিগত অদূরদর্শিতা ও অযোগ্যতার জন্য সিরাজ ব্যর্থ হননিঃ ব্যর্থতার কারণ নিহিত ছিলো তাঁর লোকজনদের চারিত্রিক ত্রুটি ও তাঁর বিপরীতে চলমান সমদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে। নবাবের নিজস্ব লোকজনদের বৈরিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা, প্রভাবশালী বাঙালীদের স্বার্থপরতা, মোগল সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে বাংলার দুর্বলতর অবিচ্ছেদ্যতা, বাংলার অবিকশিত নৌবাহিনী, বিশ্বব্যাপী দেশ জয়ের ইউরোপীয় উন্মাদনা এবং ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তারের ফলাফল হিসেবেই সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটে। সিরাজের পতনের মধ্য দিয়েই পাশ্চাত্যের কাছে পাচ্যের, ইউরোপের কাছে এশিয়ার পরাজয় ঘোষিত হয়।

নবারের সংগ্রাম এবং পরাজয় স্বাভাবিক পরিণতির সূচনা করলেও এটি ছিলো পশ্চিমা শক্তি ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রাচ্যের ব্যর্থ প্রতিরোধ। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা সাফল্য লাভ করেননি, কিন্তু তিনি স্বদেশকে তুলে দেননি সাম্রাজ্যবাদের হাতে। দেশই তাঁকে এর মাটির সাথে আবদ্ধ রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিকের মূল্যায়ন এ সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্যঃ সিরাজউদ্দৌলার যে সকল দোষই থাক না কেন, তিনি কখনো তাঁর প্রভুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি, কখনো দেশকে বিকিয়ে দেননি, পলাশীর প্রান্তরের মর্মান্তিক নাট্যমঞ্চে একমাত্র তিনিই ছিলেন মূল নায়কলাশী। যুদ্ধের সাফল্যের কৃতিত্ব স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজদের পক্ষেই যায়। নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজদের অভিযোগসমূহ ছিলো কম-বেশী তাদের কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক আক্রমণের হাতিয়ার। যুদ্ধে ইংরেজদের বিজয় শুধুমাত্র স্থানীয় শাসকের বিরুদ্ধেই ছিলো না, এর মাধ্যমে তারা তাদের আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্সের বিরুদ্ধেও জয়লাভ করে।

বাংলায় সিরাজের পতন উপমহাদেশে দুই শতাব্দীকাল বৃটিশ শাসনের উত্থানের সূচনা করে। বাংলা বিজয়ের মধ্যদিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর অর্ধেক সময় ধরে মিসর, সৌদি আরব, তুরস্ক, ইরান এবং আফগানিস্তানে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায়, সিরাজউদ্দৌলার পতন এবং মুসলিম শাসনের অবসান বৈশ্বিক পরিসরে এবং আন্তর্জাতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

সূত্রঃ পলাশী ট্রাজেডির ২৪০তম বার্ষিকী স্মারক

মোহর আলী